#আমি পদ্মজা পর্ব ৮০

পদ্মজা রান্নাঘরে জুলেখা বানুকে দেখে অবাক হলো। অচেনা হলেও সালাম দিল,' আসসালামু আলাইকুম।'
জুলেখা তীক্ষ্ণ চোখে পদ্মজার দিকে তাকালেন। অবহেলার স্বরে বললেন,'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'
রিনু ছিল রান্নাঘরে। পদ্মজা রিনুর দিকে তাকিয়ে ইশারায় প্রশ্ন করলো, অচেনা মহিলাটি কে? রিনু হেসে বললো,'মৃদুল ভাইজানের আম্মা।'
পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটলো। জুলেখার দিকে এক পা এগিয়ে এসে বললো,' দুঃখিত! চিনতে পারিনি। আপনি প্লেট ধুচ্ছেন কেন? রাখুন। আমি ধুয়ে দিচ্ছি।'
জুলেখা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি চুপচাপ

প্লেট ধুয়ে, চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন। মুখের প্রতিক্রিয়াতে পদ্মজার প্রতি ছিল অবজ্ঞা,ঘৃণা। পদ্মজা মনে মনে আহত হয়। জুলেখার দৃষ্টি ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়ার মতো ছিল। পদ্মজা জুলেখার যাওয়ার পানে চেয়ে রইলো। রিনু পদ্মজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। ফিসফিসিয়ে বললো,’আমার মনডা কয়,এই বেডির উপর জিনের আছড় আছে!’

পদ্মজা রিনুর দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকালো। বললো,’উনি আমাদের বাড়ির মেহমান! মুখে লাগাম দাও রিনু। পূর্ণার জন্য খাবার নিতে পারবো?’

লতিফা শাড়ির আঁচল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘরে ঢুকলো। পদ্মজার প্রশ্নের জবাবে বললো,’হ পদ্ম, নিতে পারবা। খাড়াও আমি দিতাছি। তুমি খাইবা কখন?’

‘পূর্ণা আর আমার খাবার একসাথেই দিয়ে দাও

বুবু।’

‘দিতাছি। রিনু জলদি ওই বাডিডা(বাটি) দে।’

রিনুর বদলে পদ্মজা এগিয়ে দিলো। খাবার নিয়ে উপরে যাওয়ার সময় পদ্মজাকে দেখে জুলেখা হাতের গ্লাস শব্দ করে টেবিলে রাখলেন। পদ্মজা বুঝতে পারে,জুলেখার ঘৃণা ও বিরক্তির কারণ! বোধহয় গতকালের অপবাদ তিনি শুনেছেন। পদ্মজার ভয় হয়। পূর্ণার বিয়েটা হবে তো? জুলেখাকে দেখে মনে হচ্ছে,বিয়ের কথা বলার অবস্থাতেও তিনি নেই। জুলেখার কপাল আর ভ্রুযুগলে পদ্মজার চোখ আটকে যায়। যেন হেমলতার কপাল আর ভ্রু দেখছে সে। হুবহু একরকম! পদ্মজার বুকটা হুহু করে উঠে। সে দুই চোখ মেলে জুলেখার কপালের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের দৃষ্টিতে যেন জন্ম জন্মান্তরের দুঃখ। পদ্মজাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জুলেখা উঠে চলে যান। পদ্মজার

সম্বিৎ ফিরলো। সে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে তৃতীয় তলায় চলে আসে। পূর্ণা দুই হাতে একটা বালিশ জড়িয়ে ধরে পরম আবেশে ঘুমাচ্ছে। জুলেখার কপাল,ভ্রু দেখে জেগে উঠা ব্যথা পূর্ণাকে দেখে আরো বেড়ে যায়। হেমলতার যৌবনকাল পূর্ণার বর্তমান রূপের প্রতিচ্ছবি। সেই মুখ,সেই ঠোঁট,সেই গাল। নাকের পাটা মসৃণ। এতো মিল দুজনের! পদ্মজা পূর্ণার মাথায় হাত রেখে হেমলতার কথা ভাবে।পুরনো স্মৃতিগুলো চোখের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। পদ্মজা পূর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলো,'আম্মা।'

তার দুই চোখ জলে ভরে উঠে। পূর্ণা কী কখনো জানবে? পদ্মজা পূর্ণার ঘুমন্ত মুখ দেখে বহুবার আম্মা বলে কেঁদেছে! সে মনকে বুঝিয়েছে, এইতো আম্মা আছে! আমার সামনেই আছে! আমি এতিম নই!

পদ্মজা হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছলো। পূর্ণা এতো আরাম করে ঘুমাচ্ছে যে পদ্মজার ঘুম ভাঙাতে মায়া হচ্ছে। কিন্তু বেলা করে খাওয়া তার একদম পছন্দ না। খেয়ে না হয় আরো ঘুমানো যাবে। পদ্মজা পূর্ণার চোখেমুখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে ডাকলো,'পূর্ণা? পূর্ণা? এই পূর্ণা?'
পূর্ণা ধীরে,ধীরে চোখ খুললো। পদ্মজা বললো,'সূর্য কখন উঠেছে খবর আছে? নামাযের তো নামগন্ধও নেই। যা দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে আয়।'

পূর্ণা অন্যদিকে ফিরে চোখ বুজলো। সে ঘুমে বিভোর। পদ্মজা আবার ডাকলো। জোর করে তুলে কলপাড়ে পাঠালো। পূর্ণা ঘুমিয়ে,ঘুমিয়ে কলপাড়ে গেল। ফিরে এলো সতেজ হয়ে। ঘরে প্রবেশ করেই সোজা লেপের ভেতর ঢুকে পড়লো। পদ্মজাকে আহ্লাদী স্বরে

বললো,’খাইয়ে দাও আপা।’
পদ্মজা বিনাবাক্যে খাইয়ে দিল। পূর্ণা না বললেও খাইয়ে দিত। খাওয়ার মাঝে পূর্ণা কথা বলতে চেয়েছিল। পদ্মজা নিষেধ করে। খাওয়ার মাঝে কথা বলা ভালো না বলে চুপ করিয়ে দেয়। খাওয়া শেষে পদ্মজা বললো,’ শেষরাতে কোথা থেকে ফিরছিলি?’
পূর্ণা চোখ বড়বড় করে তাকায়। তার হেঁচকি উঠে যায়। পদ্মজা পানি এগিয়ে দিল। তাকিয়ে রইলো সরু চোখে। পূর্ণা পানি পান করে মিনমিনিয়ে বললো,’আর যাব না।’
পদ্মজা গুরুজনদের মতো বললো,’বাড়তি কথা না বলে প্রশ্নের উত্তর দেয়া বাধ্যতা।’
পূর্ণা ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলে নতজানু হয়ে বললো,’মৃদুল যে...উনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।’
‘সে ডেকেছিল?’
‘হু।’

‘আর তুইও চলে গেলি?’

পূর্ণার মনে হচ্ছে সে ফাঁসির দঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো মুহূর্তে ঝুলে যাবে। পদ্মজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের দুই দিকে জানালা আছে। পূর্ব দিকের জানালা খোলা। উত্তর দিকেরটা বন্ধ। সে উত্তর দিকের জানালা খুলতে খুলতে বললো,’ বিয়ের আগে মাঝরাতে দেখা করা কী ঠিক হলো? মৃদুল এখনো পর-পুরুষ। বিয়েও ঠিক হয়নি। যখন এসে শুয়েছিস তখন টের পেয়েছি। তার আগে টের পেলে কানে ধরে ঘরে নিয়ে আসতাম।’

পূর্ণা অপরাধী কণ্ঠে বললো,’আপা,আর যাব না। ক্ষমা করে দাও।’

পদ্মজা পূর্ণার পাশে এসে বসে। পূর্ণার হাতের উপর নিজের এক হাত রেখে বললো,’বিয়ের পর আমার বোনের জীবনে হাজার জ্যোৎস্না আসুক।’

পূর্ণা তার অন্য হাত পদ্মজার হাতের উপর রাখলো। তারপর পদ্মজার চোখের দিকে তাকিয়ে ডাকলো,'আপা।'
'কী?'
'তোমাকে কে মেরেছে? কেন মেরেছে? তুমি রাতে কেন কেঁদেছো?'
পদ্মজা তার হাত সরিয়ে নেয়। চোখমুখে কাঠিন্য ভাব চলে আসে। কণ্ঠে গাম্ভীর্যতা রেখে পদ্মজা বললো,'প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছিলাম।'
পূর্ণা চোখ নামিয়ে বললো,'আপা,আমি জানতে চাই।'
পদ্মজা দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো,'বাড়ি ফিরে যা। মৃদুলের আম্মা-আব্বা আসছে। যখন তোকে প্রয়োজন হবে ডেকে পাঠাব। তার আগে যেন এই বাড়ির আশেপাশেও না দেখি।'
পদ্মজা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

পূর্ণা তার পায়ের উপর থেকে দ্রুত লেপ সরাল। তারপর দৌড়ে পদ্মজার সামনে এসে দাঁড়াল। অনুরোধ করে বললো,'আপা,আপা দোহাই লাগে বলো। আমি তোমার সব কথা শুনি। কিন্তু এইটা শোনা সম্ভব হচ্ছে না।'

'পূর্ণা!'

পূর্ণা আচমকা পদ্মজার দুই পা জড়িয়ে ধরলো। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো,'আপা,পায়ে পড়ছি আমাকে সব বলো। তোমার গালের ক্ষত,গলার দাগ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি শান্তি পাচ্ছি না। কে তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছে? কে এতোবড় দুঃসাহস দেখিয়েছে? আমি তার কলিজা ছিঁড়বো।'

পূর্ণার চোখের জল পদ্মজার পায়ে পড়ে। পদ্মজা পূর্ণাকে টেনে তুললো। পূর্ণার কাজল নয়ন দুটি জলে টুইটুম্বুর। যেন স্বচ্চ কালো জলের পুকুর।

পদ্মজা পূর্ণার চোখের জল মুছে দিয়ে

বললো,’কাঁদুনি।’
পূর্ণা পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। পদ্মজার শরীরে সে মা,মা গন্ধ খুঁজে পায়। সেই ছোটবেলা থেকেই পদ্মজা তার জীবন,তার আনন্দ। পদ্মজার গলার কালসিটে দাগটা যেন তারই বুকের আঘাত। রক্তক্ষরণ হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। পদ্মজা পূর্ণাকে অপেক্ষা করতে বলে,নিজের ঘরে যায়। আলমগীরের দেয়া খাম নিয়ে ফিরে আসে। দরজা বন্ধ করে পূর্ণাকে নিয়ে বিছানার উপর বসলো। এরপর বললো,’আমি জানি,আমার বোন বড় হয়েছে। সেই সাথে ধৈর্য্য,জ্ঞানও বেড়েছে। আমি একটা কারণেই তোকে সব জানাব,যাতে সাবধান থাকতে পারিস। আমি চাই , সব জানার পর তুই নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিবি না। আমি যেভাবে বলবো,সেভাবে চলবি। রাজি?’
পূর্ণা বুঝতে পারছে সে ভয়াবহ কিছু জানতে চলেছে। উত্তেজনায় তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে

পড়েছে। পূর্ণা বললো,'রাজি।'
পদ্মজা হাতের খামটা পূর্ণার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো,'তিনটে চিঠি আছে। তিনটাই আলমগীর ভাইয়ার লেখা। আমি গতকাল পড়েছি। মন দিয়ে পড়বি। অনেক কিছু জানতে পারবি। আর যতটুকু বাকি আছে আমি বলব।'
পূর্ণা প্রবল আগ্রহ নিয়ে খাম খুলে তিনটে চিঠি বের করলো। পদ্মজার কথামতো প্রথম একটা চিঠির ভাঁজ খুললো।

——

বোন পদ্মজা,
সালাম নিও। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার। সেদিনের রাতে তোমার আগমন আমার জীবনে নিয়ে এসেছে আনন্দ। পৌঁছে দিয়েছে আলোর জগতে। যে জগতে বাঁচার জন্য পিছনের প্রতিটি মুহূর্ত অসহনীয় যন্ত্রণায়

কাটিয়েছি। জানি না এতো পাপ করার পরও করুণাময় কেন আমার প্রতি এতো উদার হলেন! তিনি চেয়েছিলেন বলেই, তুমি ফেরেশতার মতো হাজির হয়েছিলে। বাঁচিয়েছিলে আমাকে আর রুম্পাকে। যখন তুমি এই চিঠি পড়ছো,তখন তোমার অবস্থা কী আমি জানি না। হয়তো সব জেনে গিয়েছো নয়তো এখনো অন্ধকারে ডুবে আছো। যদি অন্ধকারে ডুবে থাকো তাহলে আমি তোমাকে আলোর সন্ধান দেব। সব জানার পর সিদ্ধান্ত তোমার। চিঠিটা বোধহয় বড় হয়ে যাবে। এক পৃষ্ঠাতে হবে না। ধৈর্য্য ধরে সবটুকু পড়ো। আমি তোমাকে একটা তিক্ত দীর্ঘ গল্প শোনাবো। গল্পটার কেন্দ্রবিন্দু আমির হলেও জড়িয়ে আছি অনেকেই।
যখন আমিরের জন্ম হয় কাকি আম্মার পর সবচেয়ে বেশি খুশি হই আমি। কাকি আম্মা বড় দুঃখী ছিলেন। কাকা মারধর করতেন খুব। নিজ

চোখে কাকি আম্মাকে বিবস্ত্র করে মারতে দেখেছি। আমার ছোট মন লজ্জায় মিইয়ে গিয়েছিল। লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। কিন্তু কাকা বা আব্বা কাউকে একটুও মায়া দেখাতে দেখিনি,লজ্জা পেতে দেখেনি। তাদের চোখেমুখে সর্বক্ষণ হিংস্রতা ছিল। আমি খুব ভয় পেতাম আব্বাকে। ভীতু ছিলাম। আমার কাছে আমার আব্বা,কাকাই ছিল ভূত,রাক্ষস। আমার আম্মা সবসময় পাথরের মতো নিশ্চুপ। তার অনুভূতি অসাড়। কাকি আম্মা ছিলেন আমার মা। তিনি বহুবার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটা ছেলের জন্য আক্ষেপ করেছেন। কাকি আম্মা বলতেন,সেই ছেলে এসে নাকি কাকি আম্মার সব দুঃখ ঘুচে দিবে। যখন সেই ছেলেটা এলো আমি অনেক খুশি হই। এবার বুঝি কাকি আম্মার কষ্ট কমবে। কাকি আম্মা বলেছিলেন, আমির হবে পুলিশ। সব অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবে আর আমি হবো শিক্ষক। শুধু কাকি

আম্মার না আমারও ইচ্ছে ছিল আমি শিক্ষক হবো। ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়াবো। সব বাচ্চাদের আদর্শ হবো। সবাই দেখে সালাম দিবে,সম্মান করবে। সারাক্ষণ হাতে একটা বই নিয়ে হাঁটবো। এই স্বপ্ন নিয়েই পড়তে থাকি স্কুলে। এর মাঝে আব্বা একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসে। বলে, সে নাকি আমাদের আরেক ভাই। তার নাম রাখে রিদওয়ান। আমরা চার ভাই হয়ে যাই। আমি,জাফর,রিদওয়ান,আমির একসাথে এক স্কুলে পড়েছি। রিদওয়ান,আমির এক শ্রেণির ছিল। ছোট থেকেই আমিরের শরীরে ছিল অবাক করার মতো শক্তি। ওর মেধা ছিল ধারালো। আমরা সবাই ধরেই নিয়েছিলাম,আমির পুলিশ হবে। অনেক বড় পুলিশ হবে। পুরো দেশ চিনবে। ঠিক তখনই আমাকে আর জাফরকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় অভিশপ্ত এক কালো জীবনের সামনে। যে জীবনে টাকা, নারী আর রক্তের খেলা চলে।

আমাদের বুঝিয়ে দেয়া হয়,নারী হচ্ছে ভোগের বস্তু। পাতালঘরে বনেদি ঘরের দুই-তিনজন পুরুষের দেখাও মিলে। তারা দুজন নারীকে আমাদের সামনে কুৎসিত ভাবে আঘাত করে। আব্বা,কাকা উপভোগ করে সেই দৃশ্য। সেই অসহায় দুই নারীর চিৎকারে কলিজা ছিঁড়ে যায় আমার। আব্বা আর কাকার পায়ে পড়েছি যাতে তাদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু ছাড়েনি। রক্ত দেখে জাফর জ্ঞান হারায়। ও রক্ত সহ্য করতে পারতো না। রক্তে খুব ভয় ছিল জাফরের। একটা তেরো বছরের মেয়েকে বাঁধা অবস্থায় আমার হাতে তুলে দেয়া হয়। আব্বা আমাকে বুঝায়,মেয়েটার সাথে কী করতে হবে! জানতে পারি, বাড়ির পিছনে জঙ্গলে অবস্থিত এই পাতালঘর অনেক বছরের পুরনো। আমাদের বংশের প্রতিটি পুরুষের একমাত্র পেশা পতিতাবৃত্তি ও নারী ধর্ষণ। আমাদের অঢেল সম্পদ পতিতাবৃত্তির টাকায় করা। নারী বিক্রির

টাকায় করা! একরকম বাধ্য হয়েই আমাকে অভ্যস্ত করে দেওয়া হয় এই পথে। ঘৃণায় বমি করেছি অনেকবার। ধর্ষণের পর কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হতো মেয়েগুলোকে। আমার জীবন হয়ে উঠে দূর্বিষহ।

তবে ঘরে ফিরে শান্তি লাগতো। আমির ছিল সেখানে। আমিরের দুষ্টুমি আমাকে খুব হাসাতো। আমিরের একটা দোষ ছিল,ও রিদওয়ানকে খুব অত্যাচার করতো। দুজনের সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। সে যাই হোক, আমিরের সঙ্গ ছিল শান্তির! ওর চঞ্চলতা,সাহসিকতা ছিল মুগ্ধ করার মতো। আমার সেই শান্তিও একদিন নষ্ট হয়ে যায়। যেদিন নানাবাড়ি থেকে ফিরে পাতালঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান আর আমিরের উপস্থিতি দেখি! আমির তখন পুরোদমে পনেরো বছরের একটা মেয়েকে পেটাচ্ছিল! আমিরের

চোখেমুখের হিংস্রতা আমাকে অবাক করে দেয়। আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না,আমার প্রিয় ভাইয়ের এই রূপ! এই জীবন! এর পরের কথাগুলো তোমার জন্য খুব কষ্টের হবে পদ্মজা। দয়া করে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার পড়া শুরু করো।

——

পূর্ণা থামে। তার শরীর কাঁপছে। অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। সে ছলছল চোখে পদ্মজার দিকে তাকায়। তার চোখে খুব ভয়,ঘৃণা। সে স্পষ্ট স্বরে উন্মাদের মতো ডাকলো,'আপা...এই আপা।'

পদ্মজা পূর্ণার এক হাত শক্ত করে ধরলো। বললো,'ভাইয়া আমাকে যা বলেছেন,তাই কর। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নে।'

পূর্ণার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তার মাথা ভনভন করছে। শরীর যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। সে পদ্মজার এক হাত শক্ত করে ধরে

জোরে নিঃশ্বাস নিল। বুকে অপ্রতিরোধ্য তুফান বয়ে যাচ্ছে! আমির তার কাছে আপন বড় ভাই। সম্মানীয় বড় ভাই! এই ব্যথা সহ্য করতে পারবে না সে। পুরো শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভূত হচ্ছে।

চলবে...